بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ এপ্রিল, ২০২০ মোতাবেক ০৩ শাহাদাত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমান পরিস্থিতি ও এ দেশের সরকার প্রণিত আইন অনুযায়ী রীতিমত মুক্তাদী বা শ্রোতাদের সামনে বসিয়ে খুতবা প্রদান করা সম্ভব নয়। আইনের যতটুকু অনুমতি রয়েছে সে অনুযায়ী আজ এখানে মসজিদ থেকেই আমার খুতবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা, এখন আমার সামনে মসজিদে কেউ থাকুন বা না-ই থাকুন পৃথিবীতে এই মুহূর্তে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যারা এখন আমার খুতবা শুনছেন। এই একতা আমাদের সর্বদা বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং পাশাপাশি দোয়াতেও রত থাকতে হবে। আমরা এ দোয়াই করি যে, আল্লাহ তা'লা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর এই মহামারি দূর করুন এবং মসজিদের প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য আবার ফিরে আসুক।

এখন আমি খুতবার মূল বিষয়বস্তু আরম্ভ করছি। গত দুই জুমুআ পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। তিনি জামালের যুদ্ধে বা উষ্ট্রীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আমি তখন বলেছিলাম যে, এ বিষয়ে বিস্তারিত পরে বলব। তাই, আজ আমি সে বিষয়ে বলব এবং এই আলোচনায় উষ্ট্রীর যুদ্ধ সম্পর্কে উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নেরও কিছুটা উত্তর পাওয়া যাবে।

হযরত উমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে খিলাফত সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন লোকজন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওসীয়্যত করুন বা কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। এতে তিনি (রা.) বলেন, আমি কতিপয় সেসব ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের জন্য যোগ্য দেখি না যাদের প্রতি মহানবী (সা.) মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফের নাম উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু সে এই খিলাফতের পদাধিকারী হতে পারবে না। বলতে গেলে, তিনি যেন এটা আব্দুল্লাহ্কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলেছেন। যদি সা'দ এই খিলাফত লাভ করে, তবে সে খলীফা হবে; অন্যথায় তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই আমীর নির্বাচিত হবে সে যেন সা'দের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়। কেননা আমি তাকে কোন কাজে অযোগ্য ছিল বলে বা কোন অবিশ্বস্ততামূলক আচরণের জন্য অপসারণ করি নি। তিনি আরও বলেন, আমার পরে যিনি খলীফা হবেন, আমি তাকে প্রাথমিক মুহাজিরদের ব্যাপারে ওসীয়্যত করছি যে, তিনি যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন এবং তাদের সম্মান রক্ষা করেন। আর আমি আনসারদের সাথেও উত্তম আচরণ করার ওসিয়্যত করছি, কেননা তারা মুহাজিরদের পূর্বে নিজেদের ঘরে ঈমানকে আশ্রয় দিয়েছে; তাদের মধ্য থেকে কাজের যোগ্য লোকদেরকে যেন গ্রহণ করা হয়।

আর আমি তাকে সকল নগরবাসীর সাথে ভালো ব্যবহারের ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা ইসলামের মদদদাতা ও সম্পদের যোগানদাতা এবং শত্রুদের চক্ষুশূল। আর তাদের সম্মতিক্রমে তাদের কাছ থেকে কেবল তা-ই নেয়া উচিত যা উদ্বৃত্ত থাকে। আর আমি তাকে আরবের বেদুঈনদের সাথেও সদ্ব্যবহার করার ওসীয়্যত করছি, কেননা তারা আরবজাতির গোড়া এবং ইসলামের উৎসস্থল; তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ (দান হিসেবে) নিয়ে তা তাদের অভাবীদের মাঝে যেন বন্টন করে দেয়া হয়। আমি তাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জিম্মায় বা হাতে ন্যস্ত করছি। যাদের সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তার যেন ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নেয়া উচিত। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমরা তাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বের হই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত আয়েশা (রা.)-কে আস্সালামু আলাইকুম বলার পর বলেন, উমর বিন খাত্তাব অনুমতি চাইছেন। তিনি বলেন, তাকে ভেতরে নিয়ে আস। সুতরাং তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার প্রিয় দুই সাথীর সাথে রেখে দেয়া হয় বা দাফন করা হয়। তার দাফনের কাজ সম্পন্ন হলে হযরত উমর (রা.) যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন তারা সবাই সমবেত হন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, তোমাদের বিষয়টিকে নিজেদের মধ্য থেকে তিনজনের ওপর অর্পণ কর। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি আমার অধিকার হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফকে অর্পণ করছি। হযরত আব্দুর রহমান হযরত আলী এবং হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যে-ই এ বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবে আমরা তারই হাতে এ বিষয়টি ন্যস্ত করব। আল্লাহ্ ও ইসলাম যেন তার তত্ত্বাবধায়ক হয়। তাদের মধ্য থেকে তিনি এমন একজনকে নির্বাচিত করবেন যিনি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারটি দুই বুযুর্গকেই চুপ করিয়ে দেয় অর্থাৎ তারা কোন উত্তর দেননি। এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আপনারা কি এ বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দেবেন? আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আপনাদের মধ্যে যিনি উত্তম তাকে নির্বাচিত করার বিষয়ে কোন ত্রুটি করব না। তারা দু'জন বলেন, ঠিক আছে। অতঃপর আব্দুর রহমান (রা.) দু'জনের মধ্যে একজনের হাত ধরে পৃথক স্থানে নিয়ে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামেও আপনার সে মর্যাদা রয়েছে যা আপনিও জানেন। আল্লাহ্ আপনার তত্ত্বাবধায়ক। আপনি বলুন, আমি যদি আপনাকে আমীর নিযুক্ত করি তবে কি আপনি ন্যায়বিচার করবেন? আর আমি যদি উসমান (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করি তবে আপনি কি তার কথা শুনবেন এবং তার আদেশ মান্য করবেন? এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) অপরজনকে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং তার সাথে একইভাবে কথা বলেন। উভয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়ার পর তিনি (রা.) বলেন, হে উসমান (রা.)! আপনি আপনার হাত এগিয়ে দিন। এভাবে তিনি (রা.) তার হাতে বয়আত করেন এবং হযরত আলীও তার হাতে বয়আত করেন। এরপর ঘরের লোকেরাও ভেতরে আসে আর তারাও তার হাতে বয়আত করে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত উসমানের খিলাফতের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেন যে, হযরত উমর যখন আহত হন আর অনুভব করেন যে, তার অন্তিম সময় সন্নিকটে, তখন তিনি ছয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা নির্বাচিত করে নেন। সে ছয় ব্যক্তি ছিলেন– হযরত

উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের এবং হযরত তালহা। এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকেও তিনি (রা.) এ পরামর্শে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে খলীফা হওয়ার অধিকার দেন নি। তিনি ওসীয়্যত করেন যে, তারা সবাই যেন তিন দিনের ভেতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তিন দিনের জন্য সুহায়েবকে ইমামুস সালাত নিযুক্ত করেন। পরামর্শের তদারকির দায়িত্ব মিক্বদাদ বিন আসওয়াদের হাতে সোপর্দ করেন। আর তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সবাইকে একস্থানে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেন এবং নিজে তরবারি নিয়ে দরজায় পাহারা দেন। তিনি আরো বলেন, যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত থাকবে, সবাই তার বয়আত করবে। যদি কেউ বয়আত করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করবে। কিন্তু যদি উভয়দিকে তিনজন করে হয় তাহলে আব্দুল্লাহ বিন উমর তাদের মধ্য থেকে যাকে মনোনীত করবেন তিনিই খলীফা হবেন। যদি এ সিদ্ধান্তে তারা সম্মত না হয় তাহলে আব্দুর রহমান বিন অওফ যার পক্ষে থাকবেন তিনিই খলীফা হবেন। অবশেষে তালহা (রা.) সেসময় মদিনায় উপস্থিত না থাকায় পাঁচজন সাহাবী পরস্পর পরামর্শ করেন, কিন্তু কোন ফলাফল বের হয় নি। দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, ঠিক আছে, যিনি নিজের নাম প্রত্যাহার করতে চান তিনি বলতে পারেন। সবাই যখন নীরব থাকেন তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমি আমার নাম প্রত্যাহার করছি। এরপর একইভাবে হযরত উসমান (রা.) এবং অন্য দু'জনও (তা-ই করেন)। হযরত আলী (রা.) নীরব ছিলেন, অবশেষে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) থেকে অঙ্গীকার নেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেবেন না। এ অঙ্গীকার করার পর সব কাজ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তিনদিন মদিনার ঘরে ঘরে গিয়ে খিলাফতের বিষয়ে নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা খলীফা হিসেবে কাকে দেখতে চায়। এতে সবাই এই অভিমতই প্রকাশ করে যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের বিষয়ে একমত। সুতরাং তারা সবাই হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রদান করে আর তিনি খলীফা নিযুক্ত হন। এটি ইতিহাসের আলোকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বর্ণনা।

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা তফসীর ফাতহুল বারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর ওসীয়্যত করার সময় সম্ভবত হযরত তালহা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হয়ত হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর উপস্থিত হয়েছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, পরামর্শসভা শেষ হয়ে যাবার পর তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনানুযায়ী, যা অধিক সঠিক, হযরত উসমান (রা.)-এর বয়আতের আনুষ্ঠানিকতার পর তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। যাহোক, হযরত উসমান (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন, এরপর এই ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিকভাবে কাজ করা আরম্ভ করে। হযরত উসমান (রা.) যখন শহীদ হন তখন সবাই হযরত আলী (রা.)-এর কাছে ছুটে যায়, এদের মাঝে সাহাবীগণ ও তাবেঈনরা ছিলেন, তারা সবাই বলছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) হলেন আমীরুল মু'মিনীন। তারা তাঁর ঘরে এসে বলেন যে, আমরা আপনার বয়আত করছি। সুতরাং আপনি আপনার হাত দিন; কেননা আপনিই এর সবচেয়ে বেশি যোগ্য। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) বলেন, এটি তোমাদের কাজ নয়; এটি বদরী সাহাবীদের কাজ। তাঁরা যাকে পছন্দ করবেন তিনিই খলীফা হবেন। তাই সকল বদরী সাহাবী হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন যে, আমরা এই

পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক যোগ্য কাউকে দেখছি না। অতএব, আপনি আপনার হাত দিন; যেন আমরা আপনার হাতে বয়আত করতে পারি। তিনি (রা.) বলেন, হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.) কোথায়? হযরত তালহা (রা.) সর্বপ্রথম মৌখিকভাবে তার বয়আত করেন, আর হাতে হাত রেখে হযরত সা'দ (রা.) সর্বপ্রথম তার বয়আত করেন। এটি দেখার পর হযরত আলী (রা.) মসজিদে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়ান। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি উঠে এসে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে বয়আত করেন তিনি ছিলেন হযরত তালহা (রা.)। এরপর হযরত যুবায়ের (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেন।

হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেছেন কিনা– এ বিষয়টি খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের কতিপয় আপত্তির খণ্ডনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে তাই আমি ব্যাখ্যা করছি। তিনি (রা.) খাজা সাহেবকে বলেন, হযরত তালহা, যুবায়ের এবং আয়েশা (রা.)-এর বয়আত না করার বিষয়টিকে আপনি প্রমাণ হিসেবে নেবেন না। কারণ, তারা মোটেও খিলাফতের অস্বীকারকারী ছিলেন না, বরং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের প্রশ্নটি ছিল মূল বিষয়। অধিকন্তু আমি আপনাকে বলছি, যে ব্যক্তি আপনাকে বলেছে যে, তাঁরা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করেন নি, সে ভুল বলেছে। হযরত আয়েশা (রা.) নিজের ভ্রান্তি স্বীকার করে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। আর হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রা.) বয়আত না করা পর্যন্ত ইন্তেকাল করেন নি। উদাহরণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা হলো। এগুলো খাসায়েসে কুবরার ২য় খণ্ডের উদ্ধৃতি।

আরবী অংশ ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুবাদ পড়ছি। হাকেম বর্ণনা করেন, সওর বিন মুজযা আমাকে বলেছেন যে, আমি উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন হযরত তালহার পাশ দিয়ে যাই। তখন তিনি অন্তিম শ্বাস নিচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন দলের সদস্য। আমি উত্তরে বললাম, হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-এর জামা'তের সদস্য। এতে তিনি বলেন, ঠিক আছে তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও যেন আমি তোমার হাতে বয়আত করতে পারি। অতঃপর তিনি আমার হাতে বয়আত করেন আর এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি ফিরে এসে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে পুরো ঘটনা বিবৃত করি। তিনি (রা.) সব শুনে বলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্‌র রসূলের কথা কী চমৎকারভাবে সত্য প্রমাণিত হলো! আল্লাহ্ তা'লাও চেয়েছেন যে, তালহা যেন আমার হাতে বয়আত না করে জান্নাতে প্রবেশ না করেন। তিনি আশারায়ে মুবাশ্বারা (জান্নাতের সুসংবাদ লাভকারী দশজন)-এর অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মুখে একবার যখন উষ্ট্রীর যুদ্ধের উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (রা.) বলেন, এরা কী উষ্ট্রীর যুদ্ধের কথা বলছে? কোন একজন বলল, জ্বী হ্যাঁ, সেটিরই আলোচনা হচ্ছে। তখন তিনি বলেন, হায়! সেদিন যারা নীরবে বসে ছিলেন আমিও যদি তাদের মতো বসে থাকতাম। আর আমার এই বাসনা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে দশটি সন্তান জন্ম দেয়ার চেয়েও অধিক প্রবল যাদের প্রত্যেকে আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশামের মতো হবে।

এছাড়া, তালহা ও যুবায়ের আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাদেরকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন আর মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদের সত্য সাব্যস্ত হওয়া সুনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, তারা বয়আতের বাইরে থাকা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ও তওবাও করে নিয়েছিলেন। এর উদ্ধৃতিও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণ ও আলী (রা.)-এর বয়আত গ্রহণ এবং উষ্ট্রীর যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হত্যাকারীদের দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে অভিযোগমুক্ত রাখার জন্য অন্যদের ওপর অভিযোগ আরোপ করত। তারা যখন জানতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) মুসলমানদের বয়আত নিয়েছেন তখন তাঁর ওপর অভিযোগ আরোপ করার একটি মোক্ষম সুযোগ তারা পেয়ে যায়। একথা সত্য ছিল, অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের কয়েকজন যোগ দিয়েছিল। তাই, এসব মুনাফেক অভিযোগ আরোপের একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়েছিল। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে দল মক্কার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সেই দল হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে জিহাদের ঘোষণা দিতে সম্মত করে। ফলে, তিনি (রা.) জিহাদের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা.) যথাশীঘ্র হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নিবেন– এই শর্তে হযরত তালহা ও যুবায়ের তাঁর হাতে বয়আত করেন। তারা অর্থাৎ এরা দু'জন 'যথাশীঘ্র'-এর যে অর্থ বুঝেছেন তা হযরত আলী (রা.)-এর দৃষ্টিতে সময়োপযোগী ছিল না। তিনি মনে করতেন, প্রথমে সকল প্রদেশের শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক এরপর হত্যাকারীদের শাস্তির প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে। কেননা, ইসলামের সুরক্ষা হলো অগ্রগণ্য; হত্যাকারীদের বিচার বিলম্বে হলেও কোন ক্ষতি নেই। তেমনিভাবে হত্যাকারীদের সনাক্তকরণেও মতবিরোধ ছিল। যারা মুখ বানিয়ে সর্বপ্রথম হযরত আলীর কাছে পৌঁছে যায় এবং ইসলামে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে তাদের ব্যাপারে স্বভাবতই হযরত আলী (রা.)-এর সন্দেহ হয় নি যে, এরাই নৈরাজ্যের মূল হোতা। অন্যরা তাদেরকে সন্দেহ করত। এই মতবিরোধের কারণে তালহা ও যুবায়ের (রা.) মনে করেন যে, হযরত আলী (রা.) নিজের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। কেননা, তারা একটি শর্তে বয়আত করেছিলেন আর তাদের দৃষ্টিতে হযরত আলী (রা.) সে শর্ত পূরণ করেন নি। তাই তারা নিজেদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বয়আতের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করতেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর জিহাদের ঘোষণা সম্পর্কে যখন তারা অবগত হন, তখন তারাও তাঁর সাথে অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে গিয়ে যুক্ত হন এবং সবাই মিলে বসরার দিকে চলে যান। বসরার গর্ভণর মানুষকে তাঁর দলে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখে। কিন্তু মানুষ যখন জানতে পারে যে, তালহা (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) কেবল এক দৃষ্টিকোণ থেকে ও একটি শর্ত সাপেক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছেন তখন অধিকাংশ মানুষ তাঁর সাথে যোগদান করে। হযরত আলী (রা.) এই বাহিনী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনিও একটি বাহিনী প্রস্তুত করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। বসরায় পৌঁছে তিনি (রা.) এক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-র কাছে প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রথমে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনার অভিপ্রায় কী? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সংশোধনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরপর সেই ব্যক্তি হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও ডেকে পাঠায় আর তাদেরকেও জিজ্ঞেস করে যে, আপনারাও কি একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে উদ্যত? তারাও বলেন, হ্যাঁ। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনাদের উদ্দেশ্য যদি সংশোধনই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা সংশোধনের পন্থা নয় বরং এর পরিণতি হবে নৈরাজ্য। বর্তমানে দেশের অবস্থা এমন যে, আপনি যদি একজনকে হত্যা

করেন তাহলে হাজার লোক তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর বিরোধিতা করবে, আর আরো বেশি মানুষ তাদেরকে সমর্থন দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। কাজেই (এ পরিস্থিতিতে) সংশোধনের সঠিক উপায় হলো সর্বাগ্রে দেশ ও জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং এরপর দুষ্টচক্রকে শাস্তি দেয়া। অন্যথায় এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া দেশে আরো বেশি নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর সরকারই শাস্তি দিবে। একথা শুনে তারা বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর উদ্দেশ্য যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে তিনি আসুন, আমরা তাঁর সাথে বসতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে অবগত করেন এবং উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না বরং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাবাপন্থী অর্থাৎ যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার দলভুক্ত এবং হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী ছিল তারা এ সংবাদ জানার পর ভীষণ ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সংগোপনে তাদের একটি দল পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়। পরামর্শ করার পর তারা এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হওয়া আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে, কেননা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার শাস্তি আমরা ততক্ষণ এড়াতে পারি যতক্ষণ মুসলমানরা পরস্পরের মাঝে বিবদমান থাকবে। যদি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না। তাই যে করেই হোক সন্ধি হতে দিব না। ততক্ষণে হযরত আলী (রা.)'ও পোঁছে যান। তাঁর পৌঁছার দ্বিতীয় দিন তাঁর সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের সময় হযরত আলী (রা.) বলেন, আপনি তো আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু খোদার সমীপে উপস্থাপনের জন্য কোন ওজরও কি প্রস্তুত করে রেখেছেন? আপনারা যারপরনাই কষ্ট সহ্য করে যে ইসলামের সেবা করেছিলেন সেই ইসলামকে কেন আপনারা নিজ হাতে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন? আমি কি আপনাদের ভাই নই? পূর্বে তো পরস্পরের রক্তকে হারাম মনে করা হতো, কিন্তু কি কারণে আজ তা বৈধ হয়ে গেল? যদি কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হতো তাহলেও একটি কথা ছিল। যেহেতু নতুন কোন বিষয়ের উদ্ভব হয় নি তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু কী? তখন হযরত তালহা (রা.) বলেন, [তিনিও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে ছিলেন] হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যার বিষয়ে আপনি প্ররোচনা জুগিয়েছেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের প্রতি অভিসম্পাত করি। এরপর হযরত যুবায়ের (রা.)-কে হযরত আলী (রা.) বলেন, তুমি কি ভুলে গেছ, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, খোদার কসম! তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে এবং তুমি অন্যায়ের উপর থাকবে। একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রা.) নিজ সেনাদলের কাছে ফিরে যান এবং কসম খেয়ে বলেন, তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর তিনি (রা.) স্বীকার করে নেন যে, বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। এ সংবাদ যখন সেনাবাহিনীর মাঝে ছাড়িয়ে পড়ে তখন সবাই আশ্বস্ত হয় যে, এখন আর যুদ্ধ হবে না বরং সন্ধি হয়ে যাবে; কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা চরম ভয় পেয়ে যায়। রাত নেমে আসার পর তারা সন্ধিকে নস্যাৎ করার জন্য একটি চক্রান্ত করে। তাদের যেসব লোক হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল তারা হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সৈন্যদের ওপর রাতে অতর্কিতে হামলা করে আর যারা তাদের সেনাদলে ছিল, তারা হযরত আলী (রা.)-এর সেনাদলের ওপর রাতে অতর্কিত আক্রমণ করে, ফলে চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় আর উভয় দল মনে করে যে, অপরপক্ষ

তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সাবাপন্থীদের একটি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রা.) চিৎকার করে বলেন, কেউ যেন হযরত আয়েশা (রা.)-কে ঘটনা সম্বন্ধে অবগত করে, হয়ত তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর উষ্ট্রী সম্মুখে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু পরিণতি আরো ভয়াবহ হয়। নৈরাজ্যবাদীরা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে চলেছে দেখে তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, 'হে লোকেরা! যুদ্ধ পরিত্যাগ কর আর আল্লাহ্ ও বিচার দিবসকে স্মরণ কর। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা নিবৃত্ত হয় নি, বরং তারা নিরন্তর তাঁর উটকে লক্ষ্য করে তির বর্ষণ করতে থাকে। বসরাবাসীরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চারপাশে থাকা সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এটি দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যায় আর উম্মুল মু'মিনীনের সাথে এমন অবমাননাকর আচরণ দেখে তাদের ক্ষোভের কোন সীমা-পরিসীমা রইল না। ফলে, তারা তরবারি খাপমুক্ত করে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উট যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সাহাবীগণ এবং বড় বড় বীর যোদ্ধারা এর (অর্থাৎ উটের) চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যায় এবং একের পর এক নিহত হতে থাকে, কিন্তু উটের লাগাম তারা ছাড়ে নি। হযরত যুবায়ের (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেন নি, বরং অন্য দিকে চলে যান। কিন্তু এক হতভাগা নামাযরত অবস্থায় পেছন থেকে গিয়ে তাঁকে (রা.) শহীদ করে দেয়। হযরত তালহা (রা.) যুদ্ধের ময়দানেই এই নৈরাজ্যবাদীদের হাতে নিহত হন। যখন যুদ্ধ ভয়াবহরূপ ধারণ করে তখন এটি ভেবে যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না সরানো পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না, কয়েকজন তাঁর উটের পা কেটে দেয় এবং উটের হওদা বা আসন মাটিতে নামিয়ে রাখে, তখন গিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই ঘটনা দেখে মর্মবেদনায় হযরত আলী (রা.)-এর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে তাঁর কিছুই করার ছিল না। যুদ্ধ শেষে নিহতদের মাঝে যখন হযরত তালহা (রা.)-এর লাশ পাওয়া যায়, তখন হযরত আলী (রা.) খুবই মনস্তাপ প্রকাশ করেন। এই পুরো ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত যুদ্ধে সাহাবীদের কোন হাত ছিল না, বরং এই দুষ্কৃতি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে ছিল। আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) উভয়েই হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়আতকারী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কেননা, তাঁরা উভয়ে নিজেদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গ দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়েছেন। অধিকন্তু হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যাকারীদের ওপর অভিসম্পাতও করেন।

উষ্ট্রীর যুদ্ধ এবং হযরত তালহা (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক জায়গায় বলেন, নবীরা যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন প্রাথমিক দিনগুলোতে যারা ঈমান আনয়ন করে, তারাই মহান আখ্যায়িত হয়। মুসলমান মাত্রই জানে যে, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত সাঈদ (রা.) প্রমুখ এমন লোক ছিলেন যাদেরকে মহান বা সম্মানিত মনে করা হতো। কিন্তু তাদেরকে মহান এ কারণে

মনে করা হতো না যে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন, বরং ধর্মের জন্য অন্যদের চেয়ে অধিক দুঃখকষ্ট বরণ করেছিলেন বলে তাদেরকে মহান জ্ঞান করা হতো। হযরত তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর মুসলমানদের মাঝে যখন মতভেদ দেখা দেয় আর এক দল বলে যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিশোধ নেয়া উচিত– এই দলের নেতা ছিলেন হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)। কিন্তু অপরপক্ষ বলে যে, মুসলমানদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ মাত্রই মারা যায়, আপাতত আমাদের উচিত সব মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিব– এই দলের নেতা ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এই মতভেদ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) অভিযোগ করেন যে, হযরত আলী ঐসব লোককে আশ্রয় দিতে চান যারা হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করেছিল। অপরদিকে হযরত আলী অভিযোগ করেন যে, তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ অগ্রগণ্য, ইসলামের লাভ বা স্বার্থের বিষয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। মোটকথা মতভেদ চরম রূপ ধারণ করে। এরপর তাদের মাঝে যুদ্ধও আরম্ভ হয়ে যায় (আর) এমন যুদ্ধ যাতে হযরত আয়েশা (রা.) সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরুতে বিরোধী দলে ছিলেন এরপর হযরত আলী (রা.)'র কথা শুনে হযরত যুবায়ের পৃথক হয়ে যান। অপরজনও মিমাংসা করার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু যারা বিরুদ্ধবাদী ও মুনাফিক অথবা নৈরাজ্যবাদী ছিল তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। যাহোক দুটি দল ছিল যারা ছিল পরস্পর বিবদমান। উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ চলছিল, তখন হযরত তালহা (রা.)'র কাছে একজন সাহাবী আসেন এবং তাকে বলেন, তালহা! তোমার কি স্মরণ আছে, অমুক সময় আমি এবং তুমি বা আমরা দু'জন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, তালহা! এমন এক সময় আসবে যখন, তুমি এক বাহীনির অংশ হবে আর আর আলী থাকবে ভিন্ন দলে। আলী সত্যের ওপর থাকবে আর তুমি ভ্রান্তিতে থাকবে। একথা শোনার পর হযরত তালহা (রা.)'র চোখ খুলে যায় এবং তিনি বলেন, আমার একথা মনে পড়েছে। আর তৎক্ষণাৎ তিনি দল থেকে বেরিয়ে চলে যান। মহানবী (সা.)-এর কথা পূর্ণ করার মানসে তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আলী (রা.)'র বাহীনির এক দুর্ভাগা সৈন্য পেছন থেকে গিয়ে তাকে খঞ্জরাঘাতে শহীদ করে। হযরত আলী (রা.) নিজের জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত তালহার খুনী বড় পুরস্কার লাভের বাসনায় ছুটে আসে এবং হযরত আলীকে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে আপনার শত্রুর নিহত হওয়ার সংবাদ দিচ্ছি। হযরত আলী (রা.) বলেন, কোন শত্রু? সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তালহাকে হত্যা করেছি। হযরত আলী বলেন, হে দুর্ভাগা! আমিও তোকে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তুই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবি– কেননা আমার ও তালহার উপস্থিতিতে একবার মহানবী (সা.) বলেছিলেন, হে তালহা! তুমি একবার সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে লাঞ্ছনা সহ্য করবে আর তোমাকে এক ব্যক্তি হত্যা করবে কিন্তু খোদা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) আর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের এর সৈন্যসারি যখন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন হযরত তালহা নিজের অবস্থানের অনুকূলে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দিতে আরম্ভ করেন (এটি সে সময়ের

পূর্বের কথা যখন এক সাহাবী তাকে হাদীস স্মরণ করিয়েছিল আর তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তিনি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করছিলেন) তখন হযরত আলীর বাহিনী থেকে এক ব্যক্তি বলে হে নুলো, চুপ কর। হযরত তালহার একটি হাত একেবারেই বিকল ছিল, তা কর্মক্ষম ছিল না। সে যখন বলে, হে নুলো চুপ কর, তখন হযরত তালহা (রা.) বলেন, তুমি তো বললে হে নুলো চুপ কর, কিন্তু আমি কীভাবে নুলো হয়েছি তুমি কি জানো? উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবস্থা নড়বড়ে ছিল আর মহানবী (সা.)-এর সাথে শুধুমাত্র বারোজন সাথী রয়ে গিয়েছিল, তখন কাফিরদের তিন হাজার সৈন্য আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল আর তারা চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর ওপর এই মানসে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে যে, তিনি (সা.) যদি নিহত হন তাহলে সবকিছুর অবসান ঘটবে। সে সময় কাফির বাহীনির প্রত্যেক সৈন্যের ধনুক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করছিল। তখন আমি আমার হাত মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দেই। কাফির বাহিনীর প্রতিটি তির আমার এই হাতের ওপর পড়ে আর আমার হাত সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে আমি নুলো হয়ে যাই। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সম্মুখ থেকে আমি আমার হাত সরাই নি।

অন্যত্র হযরত তালহার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামালের যুদ্ধের সময় কেউ বলে যে, সেই নুলো ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এক সাহাবী, যিনি এই কথা শুনছিলেন, তিনি বলেন যে, হে দুর্ভাগা! তুমি কি জান সেই নুলো ব্যক্তি কিভাবে নুলো হলেন বা এক হাত কিভাবে হারালেন। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাহাবীদের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে যায় আর কাফেররা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মাত্র গুটি কতক সাথীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছেন, তখন কাফিরদের প্রায় তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং শত শত তিরন্দাজ ধনুক হাতে নিয়ে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে, যেন তির বর্ষণে সেই পবিত্র চেহারাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। তখন যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার সুরক্ষার জন্য নিজেকে সামনে নিয়ে আসেন তিনি ছিলেন হযরত তালহা। তিনি তার হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখে দেন। আর প্রতিটি আগত তির তাঁর (সা.) চেহারায় আঘাত করার পরিবর্তে তালহার হাতে আঘাত করতে থাকে। এভাবে অনবরত তির বর্ষিত হতে থাকে এবং সেই ক্ষত আর সামান্য ক্ষত থাকে নি বরং ক্ষতের আধিক্যের কারণে তালহার হাতের পেশী নিষ্প্রাণ হয়ে যায় এবং তার হাত অকেজো হয়ে যায়। যাকে তুমি তাচ্ছিল্যের সাথে নুলো বলছ তার নুলো হওয়া এমন নেয়ামত যার বরকত লাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকে আকুল হয়ে আছে।

রবী বিন হিরাশ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হযরত আলীর কাছে বসেছিলাম। তখন ইমরান বিন তালহা আসেন। তিনি হযরত আলীকে সালাম করেন। হযরত আলী তাকে বলেন, সুস্বাগতম হে ইমরান বিন তালহা। ইমরান বিন তালহা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে সুস্বাগতম বলছেন অথচ আপনি আমার পিতাকে হত্যা করেছেন আর আমার সম্পদ হরণ করেছেন। হযরত আলী বলেন, তোমার সম্পদ বায়তুল মালে পৃথক রাখা আছে। সকালে নিজের সম্পদ নিয়ে যেও। অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি তা এজন্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলাম যেন কোথাও মানুষ তা ছিনিয়ে না নিয়ে যায়। আর বাকি রইল তোমার এই কথা যে, আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি, সেক্ষেত্রে আমি আশা

করি, আমি এবং তোমার পিতা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (সূরা হিজর: ৪৮)

অর্থাৎ আমরা তাদের বক্ষে যে বিদ্বেষ রয়েছে তা দূর করে দিব, তারা ভাই ভাই হিসেবে উচ্চ আসনে মুখোমুখি উপবিষ্ট থাকবে।

মুহাম্মদ আনসারী নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি হযরত আলীর কাছে এসে বলে যে, তালহার হত্যাকারীকে ভেতরে আসার অনুমতি দিন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আলীকে বলতে শুনেছি যে, এই হত্যাকারীকে জাহান্নামের সংবাদ প্রদান কর। হযরত তালহা শহীদ হলে হযরত আলী যখন তাকে মৃত অবস্থায় দেখেন তখন তার অর্থাৎ হযরত তালহার চেহারা থেকে মাটি পরিষ্কার করেন এবং বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! আকাশের নক্ষত্ররাজির নীচে তোমাকে ধূলামলিন অবস্থায় দেখা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আমার দোষত্রুটি এবং দুঃখের ফরিয়াদ করছি। অর্থাৎ হযরত আলী বলেন, আমি খোদার দরবারে নিজের দোষত্রুটি এবং দুঃখের ফরিয়াদ করছি। এরপর তিনি হযরত তালহার জন্য রহমতের দোয়া করেন আর বলেন, হায়, আমি যদি এ দিন দেখার বিশ বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করতাম! তখন হযরত আলী এবং তাঁর সাথীরা অনেক কাঁদেন। হযরত আলী একবার এক ব্যক্তিকে এই পঙক্তি পাঠ করতে শুনেন যে,

ফাতান কানা ইউদনিহিল গিনা মিন সাদিকে
ইযা মা হুয়াসতাগনা ওয়া ইয়ুবিদুহুল ফাকার

অর্থাৎ সে এমন এক যুবক ছিল যে সম্পদশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকত আর অসচ্ছলতার যুগে তাদেরকে এড়িয়ে চলত। হযরত আলী (রা.) বলেন, এই পঙক্তির সত্যায়নস্থল ছিলেন আবু মুহাম্মদ তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। এখানে তার স্মৃতিচারণ শেষ হলো।

এখন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর একটি উদ্বৃতিও আমি পাঠ করছি। একবার তিনি (আ.) মুফতি সাহেবকে বলেন,

বাড়িঘর আলোকিত রাখুন। (এটি প্লেগের দিনের কথা) আজকাল ঘর খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। পোশাক ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখা উচিত। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, আজকাল বড় কঠিন দিন এবং বাতাস বিষাক্ত। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সুন্নতও বটে। পবিত্র কুরআনেও লেখা আছে,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (সূরা আল মুদ্দাস্‌সের: ৫-৬)

এরপর অপর এক স্থানে তিনি বলেন, যাদের শহর ও গ্রামে প্লেগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেন নিজ শহর থেকে অন্যত্র গমন না করে। নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করুন এবং তা উষ্ণ রাখুন। আর বিপদের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সত্যিকার তওবা করুন। পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সন্ধি করুন। রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দোয়া করুন। এরপর তিনি বলেন, নিজেদের অবস্থায় বাস্তব এবং সত্যিকার পরিবর্তনই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, **ওয়ালা নি'মা মা ক্বীলা**।

আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার তৌফিক দিন। সরকারের নির্দেশনা মেনে চলুন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখুন। ধূপ জ্বালানো উচিত। ডেটল ইত্যাদিও স্প্রে করতে থাকুন, তা সহজলভ্য। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি কৃপা ও করুণা করুন। যাহোক এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।